Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-II, published on April 2023, Page No. 338 – 347
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

বাঙালির সামাজিক পরিচয় ও বিবর্তন

ড. কমল কান্তি দাস
সহকারি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
শহীদ ক্ষুদিরাম কলেজ
ইমেইল : kamalkantidas156@gmail.com

Keyword

Abstract

Discussion

> "The Law of social evolution is the law of all evolution. Whether it be in the development of the Earth, in the development of life upon its surface, in the development of society, of Government, of Manufactures, of commerce, of Language, Literature, science, Art, this same advance from the single to the complex through successive differentiations, holds uniformly."[১]
>
> - Herbert Spencer
> 'System of Synthetic Philosophy'

বাঙালি জাতি বললে, যে জনসমষ্টি বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষা হিসেবে বা ঘরের ভাষা হিসেবে ব্যবহার করে, সেই জনসমষ্টিকে বুঝি। অবিভক্ত বাংলায় বাংলা-ভাষী জনসমষ্টির মধ্যে দেশের জলবায়ু ও তার আনুষঙ্গিক ফলস্বরূপ এই ভূখন্ডের উপযোগী বিশেষ জীবনযাত্রার পদ্ধতিকে অবলম্বন করে এবং প্রধানত প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় ভাবধারায় পুষ্ট হয়ে; হাজার বছর ধরে যে বাস্তব, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, প্রকৃতপক্ষে তাই বাঙালি জাতি ও সংস্কৃতি। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-এর কথায়— 'বাঙ্গালার সংস্কৃতি মুখ্যতঃ গ্রামজীবনকেই অবলম্বন করিয়া পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। এদিকে বাঙ্গালা-দেশ বোধহয় আদিম অষ্ট্রিক জাতি হইতে প্রাপ্ত রিক্থকেই রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল। প্রাচীন ভারতে গ্রাম ও নগর উভয়কেই আশ্রয় করিয়া সভ্যতার প্রকাশ ঘটিয়াছিল। গ্রামের বড়ো দান ছিল দার্শনিক চিন্তা ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি, নগরের দান ছিল বাস্তব সভ্যতা, কর্মপ্রাণ সভ্যতা'।[১] অবিভক্ত বাংলায় যে সংস্কৃতি গত এক হাজার বছর ধরে গড়ে উঠেছে, সমৃদ্ধতর হয়েছে কিংবা মানসিকভাবে অবলম্বন করে আত্মপ্রকাশ করেছে তার বৈচিত্র্য নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। বাংলার সমাজ যে গ্রাম জীবনকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছিল, একথা আজ সর্বজন স্বীকৃত। বহু সমালোচক মনে করেন বাঙালি জাতির সংস্কৃতি আসলে মিশ্র সংস্কৃতির— অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় এবং উত্তর ভারতের মিশ্র আর্য।

আপাতভাবে বাংলা-ভাষী জনগোষ্ঠীকেই বাঙালি জাতি বলা হলেও, একথায় বাঙালির সমগ্রতার পরিচয় ধরা পড়ে না। বর্তমানে বাঙালি জাতি ও তার সামাজিক পরিচয় বলতে আমরা যে ভৌগোলিক সীমারেখায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে বুঝি, তার অতীত এবং বিবর্তন রেখা জরিপের দরকার হয়ে পড়ে। সময় পরিবর্তনের সঙ্গে মানবজীবনযাত্রা বদলায়, বদলায় তার সাংস্কৃতিক প্রতিবেশও। স্বাভাবিকভাবে এসবের সঙ্গে ভাষাও বদলায়; এই বদল শুধু অবয়বগত নয়, ব্যবহারিকও। কোন জনগোষ্ঠীর ভাষার পরিচয় নিতে হলে তার সামাজিক পরিচয় নেওয়া জরুরি, কারণ আধুনিককালে সমাজভাষা একটি আলোচনার বিষয়। ভাষার ব্যবহারিক প্রেক্ষাপট বোঝার জন্য ব্যবহারকারীর সামাজিক পরিচয় বোঝা জরুরি। ভাষাবিদ William Labov-এর কথায়-

> "Sociolinguistics is more frequently used to describe a new interdisciplinary field - the comprehensive description of the relations between language and society."[২]

বাঙালির সামাজিক পরিচয় বোঝার চেষ্টা করলেই বাংলা ভাষার বিবর্তনরেখা এবং বহুমাত্রিক আঙ্গিকের পরিচয় পাওয়া সম্ভব। মানবসভ্যতা শুরুর সেই আদিমকালে আমাদের জন্মভূমি এই বাংলাদেশ কেমন ছিল, কেমন করে বিবর্তনের কোন পথপরিক্রমায় তা আজ এই অবস্থায়। এই প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যায় ড. অতুল সুরের মন্তব্যে —

> "বাঙালীর জীবনযাত্রা শুরু হয়েছিল মানুষের আবির্ভাবের দিন থেকে। ভূতাত্ত্বিক আলোড়ন ও চঞ্চলতার ফলে বাংলাদেশ গঠিত হয়ে গিয়েছিল প্লাওসিন যুগে। ভূতত্ত্ববিদগণের হিসাব অনুযায়ী সেটা ঘটেছিল প্রায় দশ থেকে পঁচিশ লক্ষ বৎসর পূর্বে। মানুষের আবির্ভাব ঘটেছিল আরও পরে, আজ থেকে পাঁচ লক্ষ বৎসর আগে। ... এরূপে নরাকার জীবসমূহের কঙ্কালস্থি আমরা পেয়েছি ভারতের উত্তর-পশ্চিমে শিবালিক শৈলমালা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে। বিবর্তনের ছকে তাদের আমরা নাম দিয়েছি শিবপিথেকাস, রামপিথেকাস, সুগ্রীবপিথেকাস ইত্যাদি। আরও উন্নত ধরনের নরাকার জীবের কঙ্কালাস্থি পাওয়া গিয়েছে ভারতের দক্ষিণ-পূর্বে জাভা-দ্বীপে ও চীনদেশের চুংকিং-এ। এখন এই তিনটি জায়গায় তিনটি বিন্দু বসিয়ে যদি সরলরেখা দ্বারা সংযুক্ত করা হয়, তা হলে যে ত্রিভুজ সৃষ্ট হবে, তারই মধ্যস্থলে পড়বে বাংলাদেশ।"[৩]

অ. নামকরণ –

সংসদ বাংলা অভিধানে 'বাঙালি' অর্থে বঙ্গদেশের বাংলাভাষী অধিবাসী। 'বঙ্গদেশ' ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের দেশবিভাগের আগে বাঙালির বাসভূমিকে বলা হত। ইংরাজিতে বঙ্গদেশ হল Bengal যা ইংরেজদের দেওয়া নাম। এই Bengal শব্দটি আসলে পর্তুগীজদের দেওয়া Bengala থেকে নেওয়া। অনেক সমালোচক মনে করেন Bengala শব্দটি আসলে মুসলমান শাসকদের দেওয়া 'বঙ্গালহ' শব্দের রূপান্তর। সম্রাট আকবর বাংলা অধিকার করলে এই 'বঙ্গাল' নামটা প্রচলিত হয়। 'বঙ্গাল' শব্দটি প্রাক-মুসলমান যুগে 'বঙ্গ' শব্দের সমার্থক ছিল না। 'বঙ্গ' বলতে এক বিস্তৃত ভূমিকে বোঝাত। ড. অতুল সুরের কথায়—

> "প্রথমে 'বঙ্গ' শব্দটি ছিল এক কৌমগোষ্ঠীর নাম। পরে এটা ভৌগোলিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছিল। কৌমগোষ্ঠীর নাম হিসাবে 'বঙ্গ' নামটির সঙ্গে বৈদিক যুগের আর্যরাও পরিচিত ছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আমরা বঙ্গের নাম প্রথম পাই। সেখানে বঙ্গবাসীদের 'বয়াংসি' বা পক্ষিজাতীয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বোধহয় পক্ষীবিশেষ তাদের 'টোটেম' ছিল। আরও যাদের নাম আমরা বৈদিক সাহিত্যে পাই তারা হচ্ছে 'পুণ্ড্র'।"[৪]

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভৌগোলিক সীমারেখায় বঙ্গদেশের বিভিন্ন নাম ছিল— গৌড়বঙ্গ, সমতট, চন্দ্রদ্বীপ, বাঙ্গাল, পুণ্ড্র, বরেন্দ্র, রাঢ়, তাম্রলিপ্ত, দন্ডভক্তি ইত্যাদি। গৌড় নামটি বহুপ্রাচীন। সমালোচকেরা মনে করেন একসময় বাংলাদেশে প্রচুর আখ চাষ হত, তা থেকে উৎপাদিত গুড় থেকেই 'গৌড়' নামের প্রচলন। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' এবং বাৎস্যায়ণের 'কামসূত্রেও' গৌড়ের কথা আছে।[৫] সম্রাট আকবরের বাংলাদেশ অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত এই নামেই বাংলাদেশের প্রচলন ছিল। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পর ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে বাংলাদেশের নাম হয় বেঙ্গল। আরও

২০০ বছর এই 'বেঙ্গল' নামটি নানা রাজনৈতিক কর্মকান্ড সত্ত্বেও প্রচলিত ছিল। নানা সময়ে ইংরেজ দ্বারা ভৌগোলিক সীমারেখা পরিবর্তিত হয়েছে, কখনো কিছু প্রদেশ সংযোজন আবার বিয়োজনও করা হয়েছে। অবশেষে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের সময় দ্বিখন্ডিতরূপ পশ্চিমবঙ্গ (West Bengal) এবং পূর্ব পাকিস্থান (East Pakistan)। আরও পরে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী পূর্ব পাকিস্থান নাম বদলে স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ–পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে আজও প্রচলিত 'পূর্ববঙ্গ'। অর্থাৎ বর্তমানকালে প্রচলিত 'বাংলাদেশ', 'পশ্চিমবঙ্গ' ইত্যাদি নামকরণের নেপথ্যে নানা সমাজতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক কার্যকারণ জড়িয়ে আছে।

আ. ভূতাত্ত্বিক –

পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার মতো ভারতীয় এবং বাঙালির সভ্যতাও নদীকেন্দ্রিক, অর্থাৎ নদীর তীরেই বাঙালির সভ্যতা সুচিত হয়েছিল। বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ, তার বিবর্তনের পরতে পরতে নদীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাংলাদেশ গাঙ্গেয় সমতলের অংশ, গঙ্গা নদীই বাংলাদেশের ধাত্রী-স্বরূপা। গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়ে গঙ্গা রাজমহল পাহাড়ের গিরিয়ার কাছে নিম্নগতি প্রাপ্ত হয়ে যে অববাহিকার জন্ম দিল, তাই কালক্রমে কিছুটা অংশ বাংলাদেশ নামে অভিহিত হল। কিন্তু বিষয়টা অত সরল নয়, পন্ডিতেরা মনে করেন এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল সাড়ে চারশো কোটি বছর আগে। তখন এশিয়া মহাদেশ তথা ভারতবর্ষ ছিল উত্তপ্ত স্তরে। ধীরে ধীরে শীতল হয়ে তা শিলায় রূপান্তরিত হয়। আরও পরে ভারতের মধ্যভাগে প্রাকৃতিক খেয়ালে জন্ম হয় বিন্ধ্যপর্বত-এর। হিমালয় পর্বতমালার সৃষ্টি হয় আরও কিছুটা সময় পরে। এই হিমালয় থেকেই গঙ্গা উৎপন্ন হয়ে প্রবাহিত হয়েছে, সৃষ্টি করেছে অসংখ্য নদ-নদী, শাখা-প্রশাখার। দু'কূল ছাপিয়ে প্লাবিত করেছে পার্শ্বস্থ এলাকা, জলরাশি অপসৃত হলে গজিয়ে উঠেছে নতুন নতুন ভূমিভাগ। বলাবাহুল্য এই প্রক্রিয়া কয়েক লক্ষ বৎসরের ভৌগোলিক ও ভূতাত্ত্বিক বিবর্তনের ফসল। সমুদ্রের জলরাশির এই অপসারনের কালকে ভূতত্ত্ববিদ্‌গন 'প্লাওসিন' যুগ বলেন। হিমালয় পর্বতমালার কিছু অংশ দক্ষিণে বিস্তৃত হয়ে নাগা ও গারো পর্বতমালা সৃষ্টি করেছে। এই পর্বতমালা এবং উত্তরে হিমালয় বাংলাদেশকে বেষ্টন করে আছে।

গঙ্গানদীর দক্ষিণ ধারা ভাগীরথী নামে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে, দক্ষিণ-পূর্ব ধারা পদ্মা নামে বাংলাদেশে (রাষ্ট্র) প্রবেশ করেছে। নিম্ন ধারা আরও দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে গঙ্গাসাগরে মিশেছে। আর এই গতিপথের পাশে গড়ে উঠেছে অসংখ্য গ্রাম ও জনবসতি। সমালোচকের কথায়—

> "নদীই বাংলার ইতিহাসের স্রষ্টা। নদীই বাঙালির চরিত্রকে গঠন করেছে ও তার সমাজ ও ইতিহাসকে বৈচিত্র্যময় করেছে। নদীই বাঙলার ভাগ্যবিধাতা। নদী-বহুল দেশে বাস করে বলে বাঙালী মেয়েরা হাতে শাঁখা পরে ও মাছ খায়। নদীই বাঙলাকে শস্য শ্যামলা করে তুলেছে। নদীই বাঙালিকে প্রাচীন জগতের শ্রেষ্ঠ নাবিকে পরিণত করেছিল ও বাঙালি বণিককে 'সাত সমুদ্দুর, তের নদী' পার হয়ে বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করতে সক্ষম করেছিল। আবার এই নদীই বাঙলার বুকে ডেকে এনেছিল বিদেশী বণিককে, যে বণিক তার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে তাকে নিঃস্ব করেছিল। নদী যেমন একদিকে বাঙলাকে ঐশ্বর্যশালী করেছিল, আবার অপরদিকে তাকে দীনহীন করেও ছেড়ে দিয়েছিল।"[৬]

ই. নৃতাত্ত্বিক –

নৃতাত্ত্বিক পরিচয় হল কোন গোষ্ঠীর জিনগতভাবে কিছু বিশেষ সাদৃশ্যের প্রকাশ। বাহ্যিকভাবে সকল জনগোষ্ঠীর অবয়বগত পার্থক্য আছে, আবার মিলও আছে। মিলের বা সাদৃশ্যের কারণে সমাজবিজ্ঞানীরা উক্ত গোষ্ঠীগুলিকে একই শ্রেণির পর্যায়ভুক্ত বলে সিদ্ধান্ত করেন। অবয়বগত লক্ষণগুলি বিচার করা হয় মাথার চুল, গায়ের রঙ, চোখের রঙ, দেহের উচ্চতা, মুখের গঠন, নাকের গড়ন ইত্যাদির ভিত্তিতে। এই শ্রেণিবিভাগ করা হয় জনগোষ্ঠীর প্রাথমিক সূচনা থেকে, পরবর্তীকালে উক্ত বৈশিষ্ট্যের মানুষজনকে নির্দিষ্ট অবয়বগত গোষ্ঠীভুক্ত বলে ধরা হয়।

পন্ডিতেরা মনে করেন প্রাক্-দ্রাবিড়গোষ্ঠীর লোকেরাই বাংলার আদিবাসী। এই দ্রাবিড়গোষ্ঠীর লোকেদের ভাষা হল 'অস্ট্রিক'। এই ভাষার বিস্তৃতি পাঞ্জাব থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের ইস্টার দ্বীপ পর্যন্ত ছিল। ভারতে এই ভাষার বর্তমান রূপ হল 'মুন্ডারী' ভাষা—যে ভাষায় সাঁওতাল, ভীল, কুরুম্ব, কোরওয়া, জুয়াঙ প্রভৃতি উপজাতিরা কথা বলেন।

অষ্ট্রীক ভাষাভাষীদের পর দ্রাবিড় এবং আর্যরা বঙ্গদেশে প্রবেশ করেন। যদিও আর্যরা বঙ্গদেশে তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি। যাইহোক, বাঙালির নৃতত্ত্বগত প্রধান পরিচয় হল 'অষ্ট্রিক'। অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের দৈহিক গঠনের সঙ্গে এই শ্রেণির মিল পাওয়া যায়— খর্বাকার, মাথার খুলি লম্বা থেকে মাঝারি, নাক চওড়া ও চ্যাপ্টা, গায়ের রঙ কালো, মাথার চুল ঢেউ খেলানো ইত্যাদি।[৭] বাংলার অধিবাসীদের মধ্যে সাঁওতাল, লোধা, ভূমিজ, মহালি, মুন্ডা, খেড়িয়া প্রভৃতি উপজাতিরা এই বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। Herbert Risley তাঁর 'Tribes and **Castes** of Bengal' গ্রন্থে বাংলার প্রাচীন অধিবাসীরা মঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মিশ্রণ বলে উল্লেখ করেছেন।

বাঙালি সমাজে প্রচলিত নানা জাতি ও উপজাতির অবয়বগত বৈশিষ্ট্য এভাবে চিহ্নিত করা যায়। শুধু তাই নয়, জাতি বা পদবির নামকরণের প্রেক্ষিতও বুঝতে অসুবিধা হয় না। – "ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৭ম শতক) পুণ্ড্রা, বঙ্গাঃ, রাঢ়আঃ, কর্বটাঃ প্রভৃতি জাতির পরিচয় পাওয়া যায়। এরাই বাঙালির প্রাচীন পুরুষ, এদের আগে এই ভূ-খন্ডে কারা ছিল অনুমান করলে শবর, নিষাদ, কিরাত, বাগতীত প্রভৃতি জাতির কথা ভাবতে পারা যায়। পুণ্ড্ররা বর্তমানে পোদ বা পৌন্ড্রক্ষত্রিয় জাতি'।[৮] অর্থাৎ নৃতত্ত্ব থেকে একটা জাতির বিবর্তন এবং সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিচয় উদ্‌ঘাটন করা যায়।

ঈ. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় –

মানুষের মানুষ হয়ে ওঠার পেছনে যেমন রয়েছে শ্রমের ভূমিকা, সামনের পা-দুটোকে মুক্ত করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাত দুটি ও তার দশ আঙুলকে সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করা, তেমনি রয়েছে একটি আশ্চর্য আবিষ্কার যা অন্য প্রাণীদের ক্ষেত্রে ঘটেনি। আগুনের আবিষ্কার মানুষের অগ্রগতি ও সংস্কৃতি-চিন্তায় ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন ঘটেছে তার দেহ ও দেহ থেকে মানসিক চিন্তায় অর্থাৎ সংস্কৃতিতে। খাদ্য সুপাচ্য হওয়ায় তার দেহের অভ্যন্তরে যন্ত্রপাতির ক্রিয়াকর্মও অন্য ধারায় গড়ে উঠতে লাগল, সবচেয়ে বড় কথা মস্তিষ্কের গড়নেও প্রকৃতিগত বিপ্লব ঘটে গেল। মানুষের জীবনে পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তনের সূচনা করল আগুন। "Fire was father, guardian and saviour."[৯] সংস্কৃতির উৎসার, আদিরূপ ও বিবর্তনকে অনুধাবন করার ক্ষেত্রে এই তথ্যগুলি জানা বড় জরুরি।

মানব-সংস্কৃতির তিনটি অতি স্পষ্ট বিভাজন রয়েছে। বাস্তব ও মানসিক সমস্ত সৃষ্টি নিয়েই সংস্কৃতি, তাই তার বিভিন্ন অঙ্গ তো থাকবেই। ১. বাস্তব উপকরণসমূহ (material means), এর মূল ভিত্তি জীবন-সংগ্রামের বাস্তব উপকরণ; ২. সামাজিক কাঠামো (social structure)-এর প্রধান আশ্রয় সমাজযাত্রার বাস্তব ব্যবস্থা এবং ৩. মানব - সম্পদ (human excellence), এটিই সংস্কৃতির শেষ পরিচয়। এই তিন অঙ্গের বিশ্লেষণে এটাই ধরা পড়ে যে সমাজের পরিচয় দিয়েই সংস্কৃতির পরিচয়— এটাই মৌলিক সত্য।

বাঙালির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় বুঝে নিতে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পরিস্ফুটন করব। এর ফলে বর্তমানের বাঙালির একটা বিবর্তন রেখা স্পষ্ট হবে।

ক. জাতি বিন্যাস –

প্রাচীন বর্ণাশ্রম প্রথা (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র) বাংলার সামাজিক সংগঠনের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে প্রযোজ্য নয়। বাংলার সমাজ ছিল মূলত কৌমসমাজ ভিত্তিক, বৃত্তিধারী জাতিগোষ্ঠীর সমাজ। এই সকল জাতিগোষ্ঠীর নামেই জনপদগুলির নামকরণ হত। যেমন— পুন্ড্র (বর্তমানে পোদ বা পৌন্ড্রক্ষত্রিয় জাতি), বঙ্গ, কর্বট ইত্যাদি। বাংলার আদিম জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে হাড়ি, ডোম, বাউরি এবং সদ্‌গোপদের প্রাধান্য ছিল। চর্যাপদ থেকেও আমরা ডোম জাতির পরিচয় পাই। কাহ্নপাদ রচিত ১০ সংখ্যক পদে আছে—

"নগর বাহিরেঁ ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাহ সো বাহ্ম নাড়িআ।।

আলো ডোম্বী তোত্র সম করিব ম সাঙ্গ।
নিঘিন কাহ্ন কাপালি জোই লাগ।।"[১০]

এছাড়া শবর, কাপালিক প্রভৃতি জাতির কথাও চর্যাপদ থেকে জানা যায়। ড. অতুল সুরের মতে গুপ্তযুগের পূর্বে ব্রাহ্মণ্যধর্ম বাংলাদেশে বিস্তার লাভ করেনি। গুপ্তযুগেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ব্রাহ্মণরা আসতে শুরু করেন এবং তারা 'শর্মা' ও 'স্বামিন' উপাধি নিয়ে বসবাস করতে থাকেন, এরাই পরবর্তীকালে ভট্টাচার্য, চট্টোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি পদবীতে পরিচিত হন। এছাড়া ব্রাহ্মণদের মধ্যেই দত্ত, পাল, মিত্র, বর্মন, দাস, ভদ্র, সেন, দেব, ঘোষ, পালিত ইত্যাদি উপাধি ছিল। সেন রাজা বল্লাল সেনের আমলে কৌলীন্য প্রথার প্রচলন হয় এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বাড়বাড়ন্ত শুরু হয়। 'বৃহদ্ধর্মপুরান' এ বাংলায় জাতি ও উপজাতির তালিকা আছে, তা হল –

১. উত্তম শঙ্কর - (ক) করণ, (খ) অম্বষ্ট, (গ) উগ্র, (ঘ) মগধ, (ঙ) গন্ধবণিক, (চ) কাংস্যবণিক, (ছ) শঙ্খবণিক, (জ) কুম্ভকার, (ঝ) তন্তুবায়, (ঞ) কর্মকার, (ট) সদ্‌গোপ, (ঠ) দাস, (ড) রাজপুত, (ঢ) নাপিত, (ণ) মোদক, (ত) বারুজীবী, (থ) সুত, (দ) মালাকার, (ধ) তাম্বুলি, (ন) তৈলক।

২. মধ্যম শঙ্কর - (ক) তক্ষ, (খ) রজক, (গ) স্বর্ণকার, (ঘ) সুবর্ণবণিক, (ঙ) আভীর, (চ) তৈলক, (ছ) ধীবর, (জ) শৌন্তক, (ঝ) সট, (ঞ) শবক, (ট) জালিক।

৩. অন্ত্যজ - (ক) গৃহি, (খ) কুড়ব, (গ) চন্ডাল, (ঘ) বাদুর, (ঙ) চর্মকার, (চ) ঘট্টজীবী, (ছ) দোলবাহী, (জ) মল্ল।[১১]

অর্থাৎ বুঝতে অসুবিধা হয় না বাংলার জাতিবিন্যাস বৃত্তিগত, কর্মগত এবং নৃতাত্ত্বিকভাবে প্রচলিত ছিল। পরবর্তীতে এর নানা পরিবর্তন ঘটল, বাঙালির সামাজিক বিবর্তনের পাশাপাশি জাতিগত বিবর্তনও সম্পন্ন হল।

খ. অর্থনীতি –

যেহেতু প্রাচীন বাংলার সমাজ ছিল কৌমসমাজ, তাই প্রধানত শিকারই ছিল জীবধারনের উপায়। চর্যাপদ থেকেও আমরা শিকারের কথা জানতে পারি –

"জই তুমুহে ভুসুকু অহেরি জাইবেঁ মারিহসি পঞ্চজ না।
নলনীবন পইসন্তে হোহিসি একুমনা।"[১২]

পরবর্তীকালে কৃষিকাজই মূল বিষয় হয়ে ওঠে। নদীমাতৃক বাংলাদেশের উর্বর ভূমিভাগে যে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হত তার প্রমাণ নানাভাবে পাওয়া যায়। তাই জমি এবং উৎপন্ন ফসল ছিল তৎকালীন বাংলার অর্থনীতির প্রধান মানদন্ড। এই ফসলের আদান-প্রদানের মাধ্যমেই জীবনধারণের প্রয়োজনীয় পরিষেবা পাওয়া যেত। শুধু তাই নয়, জমিদার বা সরকারি খাজনাও শস্য ও ফসলের মাধ্যমে করা যেত। ধান, গমের পাশাপাশি প্রচুর আখের চাষ হত। কৃষিকাজ ছাড়াও তামা এবং লোহার উৎপাদন প্রচলিত ছিল। প্রাচীন বাংলায় শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে 'মসলিন' বা কার্পাসবস্ত্রের সুনাম ছিল। বণিক শ্রেণি তখনও ছিল, তবে বর্তমানকালের মতো শিল্প মালিক ছিল না। মূলতঃ উৎপাদিত পণ্যের মজুত ও বিক্রয়ই ছিল ব্যবসার প্রধান অবলম্বণ। সমাজে নানা পেশার প্রচলন অবশ্য ছিল কিন্তু সবার প্রায় কৃষিকর্ম ছিল আবশ্যিক। ইংরেজ আগমনে, শিল্প বিপ্লবের কারণে, শিক্ষা বিস্তারের ফলে বাঙালির অর্থনৈতিক চিত্র বদলে যায়। অর্থনৈতিক মানদন্ডের বিচারে সামাজিক বিন্যাসের এক অভিনব কাঠামো গঠিত হয়— উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত। কৃষিকর্ম থেকে শিল্প এবং পরিষেবামূলক পেশায় মানুষজনের আগ্রহ বাড়তে থাকে। অর্থনৈতিক কাঠামোই সমাজের প্রধান চালিকাশক্তি হয়ে ওঠে।

গ. ধর্মসাধনা –

পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশের যে ভূখণ্ড আজ বীরভূম নামে পরিচিত, তা বাঙালির ধর্মসাধনার আঁতুড়ঘর। —'বর্ধমান জেলার উত্তরে ত্রিভূজাকার যে ভূখণ্ড আজ বীরভূম নামে পরিচিত, তাকে আমরা বাঙলার ধর্মীয় সাধনার 'যাদুঘর' বলে অভিহিত করতে পারি। বহু ধর্মেরই এখানে প্রাদুর্ভাব ঘটেছে এবং বীরভূমের বিচিত্র ভূপ্রকৃতি তার সহায়ক হয়েছে। ... বীরভূমের বনজঙ্গলের মধ্যেই ছিল বহু মুনি-ঋষির তপোবন। যেমন ভান্ডীরবনে ছিল বিভান্ডক ঋষির আশ্রম, শিয়ানে ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির, শীতলগ্রামে সন্দীপন ঋষির, গর্গমুনির ও দুর্বাশা মুনির। বন-জঙ্গলের শাশ্বত নির্জনতা বীরভূমকে গড়ে তুলেছিল শাক্তধর্মীয় সাধনার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্ররূপে। ... তন্ত্রবর্ণিত মহাপীঠসমূহের মধ্যে বীরভূমে যত মহাপীঠ আছে, এত মহাপীঠ বাঙলায় তো দূরের কথা, ভারতের আর কোথাও নেই। বীরভূমের প্রায় প্রত্যেক শহরের কাছেই সতীর দেহাংশের ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি করে শাক্তপীঠ আছে। যথা—বক্রেশ্বর, কঙ্কালীতলা, লাভপুর, ফুলবেড়িয়া, নলহাটি, বৈদ্যনাথধাম, তারাপীঠ ইত্যাদি।'[১৩]

বীরভূম সমতল অঞ্চলে জয়দেবের কেঁদুলি, চণ্ডীদাসের নানুর এবং নিত্যানন্দ প্রভুর সাধনক্ষেত্রও উল্লেখযোগ্য। ধর্মরাজ-এর জন্যও বীরভূম প্রসিদ্ধ। এমনকি মনসাদেবীর পূজার উদ্ভবও বীরভূম অঞ্চলে হয়েছিল বলে সমালোচকরা মনে করেন। পালরাজাদের শাসনকালে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটেছিল, কিন্তু মুসলমান আক্রমণে তার বিলুপ্তি ঘটে। বাঙলা বিজয়ের সময় মুসলমান শাসক বৌদ্ধমঠ ও বিহারের ক্ষয়সাধন করে। বাংলাদেশে শক্তিসাধনার পাশাপাশি শৈবসাধনা হত, নানা জায়গায় ছড়িয়ে থাকা শিব মন্দির এর প্রমাণ দেয়। পাশাপাশি ভাগবত ধর্মের উপাস্য দেবতা বিষ্ণু এবং তার থেকে 'বৈষ্ণব' ধর্মের প্রচলন ঘটে। লক্ষণ সেন 'পরমবৈষ্ণব' উপাধি গ্রহণ করলে বৈষ্ণবধর্মের প্রাদুর্ভাব ঘটে। বাউরি, বাগদি, হাড়ি, ডোম ইত্যাদি জাতির মধ্যে ধর্মঠাকুরের পূজার প্রচলনও ছিল। আমরা আগেই দেখেছি বাংলার সমাজ প্রাথমিকভাবে আদিবাসী কৌমসমাজের সমাজ, ফলে তাদের ধর্মসাধনায় এইসকল দেবীর আরাধনার প্রভাব ছিল। চণ্ডীমঙ্গলের প্রধান চরিত্র কালকেতু যে আদিবাসী সমাজের প্রতিনিধি তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। বাংলার সমাজে প্রাক-আধুনিককাল পর্যন্ত এইসকল দেব-দেবীর প্রভাব ছিল। পরবর্তীকালে শাক্ত আরাধনায় উচ্চবর্ণের (যেমন- শ্রীরামকৃষ্ণ ওরফে গদাধর চট্টোপাধ্যায়) মানুষদের যোগদান, আচার সর্বস্বতার জায়গায় মানবধর্মের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি সর্বস্তরে এর ব্যাপক প্রসার ঘটায়। এছাড়াও বাংলাদেশে বহু ধর্মীয় মহাপুরুষ দেবতার ন্যায় পূজিত হন, উদাহরণ হিসাবে— শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, লোকনাথ, বামাখ্যাপা প্রমুখের উল্লেখ করা যায়।

ঘ. ভাষা –

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাকে যে কয়টি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে তার মধ্যে ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য (Indo-European or Aryan) ভাষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষাবংশ। এই ভাষাবংশ থেকেই বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত আধুনিক ভাষাগুলির জন্ম, বলাবাহুল্য আমাদের বাংলা ভাষারও প্রপিতামহ এই ভাষাবংশ। বাংলা ভাষার জন্মবৃত্তান্ত একটি ছকের সাহায্যে নেওয়া যেতে পারে।

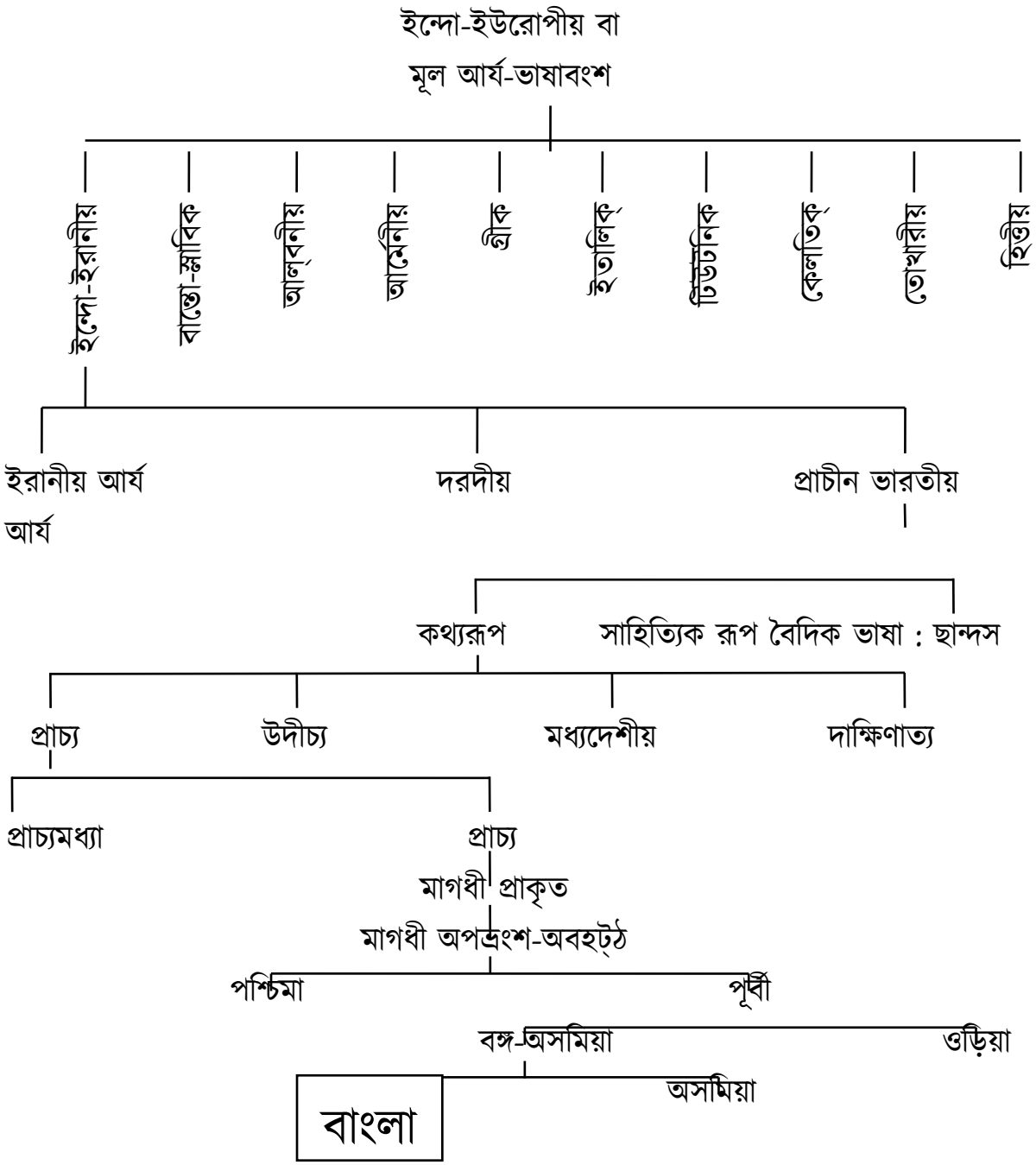
ইন্দো-ইউরোপীয় বা
মূল আর্য-ভাষাবংশ
ইন্দো-ইরানীয়
বাল্তো-স্লাবিক
আলবনীয়
জার্মেনীয়
গ্রীক
ইতালিক
টিউটনিক
কেলতিক
তোখারীয়
হিত্তীয়
ইরানীয় আর্য
আর্য
দরদীয়
প্রাচীন ভারতীয়
কথ্যরূপ
সাহিত্যিক রূপ বৈদিক ভাষা : ছান্দস
প্রাচ্য
উদীচ্য
মধ্যদেশীয়
দাক্ষিণাত্য
প্রাচ্যমধ্যা
প্রাচ্য
মাগধী প্রাকৃত
মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্ঠ
পশ্চিমা
পূর্বী
বঙ্গ-অসমিয়া
ওড়িয়া
অসমিয়া
বাংলা

বাংলা

	৯০০ খ্রীঃ		
চর্যাগীতি ইত্যাদি			প্রাচীন বাংলা (Old Bengali)
অনুর্বর পর্ব	১২০০ খ্রীঃ –	অন্ধকার	
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন	১৩৫০ খ্রীঃ –		
বৈষ্ণব সাহিত্য	১৫০০ খ্রীঃ –	আদ্যি মধ্য	মধ্য বাংলা (Middle Bengali)
মঙ্গলকাব্য		অন্ত্যমধ্য	
রামায়ণ			
মহাভারত			
ভাগবতের অনুবাদ ইত্যাদি	১৭৬০ খ্রীঃ –		
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ও খ্রীস্টান মিশনারীদের লেখা, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদির রচনা ও মৌখিক বাংলা	বর্তমান কাল [১৪]		আধুনিক বাংলা (ModernBengali)

অনেক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলার সমাজের পাশাপাশি ভাষাও বিবর্তিত হয়েছে। বিভিন্ন পর্বে ভাষার রূপতাত্ত্বিক, ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তন-এর মাধ্যমে আজকের বাংলা ভাষা। কিন্তু এই ভাষাও স্থির নয়; নদীর মতো সেও বয়ে চলেছে; পারিপার্শ্বিকের নানা উপাদান তার মধ্যে সংযুক্ত হচ্ছে আর ভাষা হয়ে উঠছে বৈচিত্র্যময়।

বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন হিসাবে চর্যাপদের কথা সর্বজনবীদিত। এই পদগুলিতে হাজার বছর আগের বাঙালির জীবনচর্যা চমৎকারভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এরপর তুর্কি আক্রমণ সাহিত্য সাধনায় স্তব্ধতা এনে দেয়, ধীরে ধীরে আবার সাহিত্য সাধনার গতিমুখ খুলে যায়। অনুবাদ সাহিত্য-মঙ্গলকাব্য-চৈতন্য সাহিত্য-পদাবলীর হাত হয়ে বাঙালি আধুনিক সাহিত্যে পদার্পন করে। বহু মানুষের যোগদানে বাংলা সাহিত্য বিশ্ব সাহিত্যের সমান যোগ্যতায় উত্তীর্ণ হয়। এই বহমান ধারা আজও সমান বেগে সমকালকে ধারণ করে বয়ে চলেছে।

ঙ. বিশ্বাস-সংস্কার ও আচার –

বাংলার প্রাচীন অধিবাসীরা ছিল অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাভাষীর লোক। এদের মধ্যে প্রচলিত ছিল Primitive Culture বা বিশ্বাস-সংস্কার, পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাবে এই সব আচার-সংস্কার গৃহীত হয় এবং কালক্রমে তা উচ্চশ্রেণির সমাজেও প্রচলিত হয়। মৃত্যুর পরে আত্মার শক্তিতে বিশ্বাস, নানাপ্রকার মন্ত্র ও ম্যাজিক, Fertility Cult বা উৎপাদিকা শক্তিকে পূজার্চনা, লিঙ্গ পূজা, কুমারী পূজা, ট্যাবু ও টোটেম বিশ্বাস, অ্যানিমিজম-অ্যানিমিটিজম, নানা

নিষেধ ও বারণ এসবই আদিম অধিবাসীদের গঠিত বিশ্বাস ও সংস্কার। পরবর্তীকালে বৈদিক আর্যরা এইসকল আচার গ্রহণ করে এবং বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়। –'ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনেক কিছু পূজা-পার্বনের অনুষ্ঠান, যেমন— দূর্গাপূজার সহিত সংশ্লিষ্ট নবপত্রিকার পূজা ও শারদোৎসব, নবান্ন, পৌষপার্বণ, হোলি, ঘেঁটুপূজা, চড়ক, গাজন প্রভৃতি এবং আনুষ্ঠানিক কর্মে চাউল, কলা, কলাগাছ, নারিকেল, সুপারি, পান, সিঁদুর, ঘট, আল্পনা, শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি, গোময় এবং পঞ্চগব্যের ব্যবহার ইত্যাদি সবই আদিম অধিবাসীদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল। তাদের কাছ থেকে আরও নেওয়া হয়েছিল আটকৌড়ে, শুবচনী পূজা, শিশুর জন্মের পর ষষ্ঠী পূজা, বিবাহে গাত্রহরিদ্রা, পানখিলি, গুটিখেলা, স্ত্রী-আচার, লাজ বা খই ছড়ানো, দধিমঙ্গল, লক্ষ্মীপূজার সময় লক্ষ্মীর ঝাঁপি স্থাপন, অলক্ষ্মীর পূজা ইত্যাদি আচার-অনুষ্ঠান যা বর্তমানকালেও বাঙালী হিন্দু পালন করে থাকে। এসবই প্রাক্-আর্য সংস্কৃতির অবদান।'[১৫]

চ. ব্যবহারিক জীবন –

প্রাচীন বাংলায় গ্রামের লোক এখনকার মতোই কুঁড়ে ঘরে বাস করত। চাল হত খড় বা ছনের এবং দেওয়াল হত কাঁচামাটির। অবশ্য বাঁশের বেড়া এবং কাঠ দিয়ে ও মাটির প্রলেপ দিয়ে দেওয়াল তৈরিও হত। ঘরের মধ্যে বসার জন্য মাদুর ও পিঁড়ির ব্যবহার ছিল। খাওয়া-দাওয়া হত মাটি বা ধাতুনির্মিত বাসনে। শহরাঞ্চলে ইট দিয়ে বাড়ির প্রচলন ছিল। মাটি দিয়ে গাঁথা ইট চুন-সুরকি দিয়ে প্রলেপ দেওয়া হত। শোবার জন্য খাট-পালঙ্কের ব্যবহার ছিল আর ধনীলোকেরা সোনা-রূপার বাসন ব্যবহার করত। বাঙালির রসনার সবচেয়ে প্রাচীন যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা হল-

"ওগগর ভত্তা
রম্ভঅ পত্তা।
গায়িক ঘিত্তা
দুগ্ধ সজুত্তা।
মোইনি মচ্ছা
নালিচ গচ্ছা।
দিজ্জই কন্তা।
খাই পুনবন্তা।।"[১৬]

মাছ বাঙালির প্রিয় খাদ্য, এমনকি বৌদ্ধধর্মের প্রভাবেও মৎস্যপ্রীতি ক্ষুণ্ণ হয়নি। নিম্নশ্রেণির লোকেরা শূকর মাংস খেত তার প্রমাণ পাওয়া যায়। চর্যাপদের বহু পদে শিকারের উল্লেখ পাওয়া যায়। বস্তুত প্রাক-বৈদিক যুগে বাঙালির খাদ্যা-খাদ্যের কোন বিচার ছিল না, অনেক পরে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাবে কিছু বিধিনীষেধ আরোপ হয়। নানা সময়ে খাবারের উপর বিভিন্নরকম নিষেধ চালু হয়েছে।

বাঙালির খাদ্য তালিকায় যেসব শাক-সব্জীর কথা জানা যায় তা হল— পলতা, নটে, কলমি, হিঞ্চে, পুঁই, কুমড়া, পাটশাক ইত্যাদি। এছাড়া লাউ, বেগুন, ঝিঙা, চালতা, কাঁচকলা, কন্দ আলু, রাঙা আলু, পেঁয়াজ প্রভৃতির কথাও জানা যায়। ফলমূলের মধ্যে ছিল কন্দ, মাদার, বেল, কলা, কাকুড়, আখ, নারিকেল, তাল, কাঁঠাল, আম, কালোজাম প্রভৃতি। ধাতুর পাশাপাশি নানা ফুলের মালাও যে অঙ্গসজ্জায় ব্যবহৃত হত সেই বিবরণ চর্যাপদেই পাওয়া যায়। —"উঞ্চা উঞ্চা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।/ মোরঙ্গি পীচ্ছপরহিন সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী।।"[১৭] সিঁদুর এবং শাঁখার প্রচলন বর্তমানকালের মতো তৎকালীন সময়েও ছিল। বর্তমানে বাঙালির পোষাকের মধ্যে বৈচিত্র্যের কার্যকারণ ইংরেজ আগমন এবং আরও পরবর্তীকালে স্বাধীনতা উত্তর আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন। বর্তমানে বাঙালি সমাজে প্রচলিত পোশাকে সর্বভারতীয় ঘরানার পাশাপাশি পাশ্চাত্য প্রভাবও পরিদৃষ্ট হয়। প্রাথমিকভাবে কৃষিকর্ম ছিল প্রধান কর্ম, ধীরে ধীরে নানা পেশার উদ্ভব হল। মূলতঃ পাল ও সেনযুগ থেকেই রাজকর্মচারীর শ্রেণির উদ্ভব হয়, ক্রমশ রাজদরবারে কাজ করা সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে আকর্ষণীয় হয়ে উঠল।

একসময় প্রাচীন বাংলা ছিল গ্রামীন কৃষিপ্রধান সমাজ। কিন্তু পরবর্তীকালে শহরে বা কলকাতার জীবনচর্যায় রূপান্তরিত বাংলা-সংস্কৃতি পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্বত্র প্রচলিত হল। শহরের অভিজাত সম্প্রদায়ের জীবনপ্রনালী প্রথমদিকে

সাধারণ লোককে প্রভাবান্বিত করেনি। সাধারণ লোক নিষ্টাবান ও গ্রামীন সংস্কৃতিরই ধারক রয়ে গিয়েছিল। এই পরিস্থিতি বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত বজায় ছিল, বিশেষ করে পাল-পার্বন, ধর্মকর্ম ও সামাজিক আচার-বিচারে। কলকাতার যে নতুন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের উদ্ভব হল, তাদের পুরুষরা ইংরেজি শিক্ষা পেয়ে উদারনীতিক হলেন ঠিকই কিন্তু মহিলারা রক্ষণশীলা থেকে গেলেন। ১৮৪৯ সালে বেথুন স্কুল স্থাপিত হলে মহিলার শিক্ষালাভ করলেন বটে, কিন্তু তাদের বেশিরভাগ দশ বছরের কম বয়সী।

পরিবর্তন ঘটল পোশাক-আশাকে, এমনকি আচার আচরণেও। ধুতি, চাদর, পাগড়ি, কামিজ পিরান, শেমিজ, ফ্রক এখন অবলুপ্তপ্রায়। মহিলাদের ব্যবহৃত গোট, বিছা, নথ, নোলক ইত্যাদি গহনা এখন দেখা যায় না। খেলাধুলার মধ্যে ড্যাংগুলি, মারবেল, ঘুড়ি ওড়ানো সরে গিয়ে ক্রিকেট জনপ্রিয় হয়েছে। এই পরিবর্তন বা বিবর্তনের নেপথ্যে শিক্ষার প্রসার, মুদ্রণের প্রবর্তন, সাহিত্যসৃজন, যন্ত্রশিল্প, পরিবহন ব্যবস্থার পাশাপাশি নানা প্রদেশ ও বিদেশী নাগরিকদের সংস্পর্শ কার্যকরি ভূমিকা নিয়েছে। তবে কিছু মৌলিক আচার-বিশ্বাস এখনো থেকে গেছে। অতি আধুনিক শহরবাসী মানুষজনকেও জন্ম-বিবাহ-মৃত্যুকালীন আচার নির্দ্বিদায় মান্য করতে দেখা যায়। মাত্র কয়েকশ বছরে একটা জাতির ব্যবহারিক জীবনের এই পরিবর্তন অভূতপূর্ব। বাঙালির সামাজিক পরিচয় শুধুমাত্র কিছু আঙ্গিকের পরিপূর্ণতায় সম্পূর্ণতা পায় না, তার পরিচয় আরো বিচিত্র ও বহুমুখি।

তথ্যসূত্র :

১. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার : 'জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য'। রাঁচি হিন্দু ফ্রেন্ডস্ ইউনিয়ন কর্তৃক আহুত সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণে পঠিত; কার্তিক ২১, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ

২. William Labov **:** 'Social Stratification of Language in New York city; Washington D. C., Centre for Applied Linguistics, 1966, preface- VI

৩. ড. সুর, অতুল : 'বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন' / সাহিত্যলোক, কলকাতা-৬ / চতুর্থ সংস্করণ। এপ্রিল২০১২, পৃ. ৫

৪. তদেব**,** পৃ. ২৬

৫. তদেব, পৃ. ৩০

৬. তদেব**,** পৃ. ৩৯

৭. তদেব, পৃ. ৪৮

৮. মিদ্যা, বিকাশকান্তি : 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার স্থান নাম' / লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা-৬৮, প্রথম প্রকাশ, মার্চ-২০১০, পৃ. ৮০

৯. Rosny J. S. : Aine : Quest for Fire; Penguine Books, Great Britain, **1981,** P.17

১০. ড. দাশ, নির্মল : 'চর্যাগীতি পরিক্রমা' / দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩। দ্বিতীয় সংস্করণ। ডিসেম্বর-২০০২, পৃ. ১৩৭

১১. ড. সুর, অতুল : 'বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন; পৃ. ১০৬

১২. ড. দাশ, নির্মল : 'চর্যাগীতি পরিক্রমা'; পৃ. ১৭৩

১৩. ড. সুর, অতুল : 'বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন'; পৃ. ১২৩

১৪. ড. শ, রামেশ্বর : 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা' / পুস্তকবিপণি, কলকাতা-৯ / তৃতীয় সংস্করণ। অগ্রহায়ণ-১৪০৩, পৃ. ৬২২

১৫. ড. সুর, অতুল : 'বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন'; পৃ. ৮৪

১৬. সেন, সুকুমার : 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস-১ম খন্ড'/আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯/প্রথম আনন্দ সংস্করণ, জানুয়ারি-১৯৯১, পৃ. ৫০

১৭. ড. দাশ, নির্মল : 'চর্যাগীতি পরিক্রমা'; পৃ. ১৮০